এই সংখ্যায় ভিতরের পাতায়
√ জোনাকিরা জ্বলিতেছে
√ ভর নিয়ে ভারী কথা
√ বিষধর ও বিষহীন সাপের কামড়ের পার্থক্য

বিজ্ঞান অন্বেষক

© ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -২ পঞ্চম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর /২০০৫ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

অবাক পৃথিবীর জলকথা

পৃথিবী কতটা অবাক বা বিস্ময়ের তা জানতে হলে পৃথিবীর জলসম্পদ বা 'জলকথা' জানতে হবে। সমগ্র জীবজগতের একটি অপরিহার্য উপাদান হল জল। অবাক পৃথিবীর সাথে মানুষের এব্যাপারে যথেষ্ট মিল—মানুষের দেহে শতকরা ৭০ ভাগ জল আর পৃথিবীরও প্রায় ৭১ ভাগ জল। এত বড় পৃথিবীর ৭১ ভাগ জল অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রচুর জল, তবে প্রচুর জলের বেশীরভাগটাই মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। পৃথিবীতে মোট জল প্রায় ১৪০ কোটি ঘন কিমি। এর প্রায় ৯৭ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৩৫.৮ কোটি ঘন কিমি জল সমুদ্রের নোনা জল। এই জল আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি না। বাকি ৩ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৪.২ কোটি ঘন কিমি জল মিষ্টি জলের আওতায়। তবে এই পুরো মিষ্টি জলটাই আমরা ব্যবহার করতে পারি না। এর বেশীরভাগটাই, মোট জলের ২.৩১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৩.২৩ কোটি ঘন কিমি জল উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বরফে জমে আছে। বাকী মোট জলের ০.৬৯ ভাগ জল অর্থাৎ মাত্র ০.৯৭ কোটি ঘন কিমি জল ভূগর্ভে, নদী-নালা, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয়গুলিতে এবং বায়ুতে জলীয় বাষ্প হিসাবে পাওয়া যায় এবং এই জলই আমরা সরাসরি ব্যবহার করি।

মানবসভ্যতায় জলের প্রয়োজন বিচার করলে, প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনকে ভাগ করা যায়। যথা- কৃষিকাজ, শিল্পকারখানা ও গৃহস্থালী। গৃহস্থালীতে জলের প্রয়োজন সবগুলি প্রয়োজনের সাপেক্ষে তৃতীয় হলেও এই ক্ষেত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় 'পানীয় জল' এই ক্ষেত্রটিরই অন্তর্গত। পৃথিবীর পুরো জলকে যে যে ভাগে ভাগ করেছি সব ক্ষেত্রের জলই দূষিত হতে পারে, তবে আমরা ভাববো ০.৬৯ ভাগের জল অর্থাৎ আমাদের ব্যবহার্য জল কি কি কারণে দূষিত হচ্ছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জল পৌঁছয়নি। আমাদের রাজ্যেও বেশ কয়েকটি জেলায় পানীয় জলের সঙ্কট আছে। আবার এ রাজ্যে যারা পানীয় জল পাচ্ছে তারাও সকলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছে না। বিভিন্ন দূষণে দূষিত হওয়া জল পান করছে। প্রতিনিয়ত দূষিত জল ব্যবহারে ও পান করার ফলে প্রতিবছরই বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ ও গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। জলবাহিত বেশ কয়েকটি রোগের শিকার হতে হয়। যেমন ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, পোলিও, জিয়ার ডিয়াসিস ইত্যাদি। এই সব রোগের জীবাণু রোগীর দেহ থেকে জলে মেশে। ঐ উৎস থেকে জল ব্যবহারকারী সকলের মধ্যে ঐ রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

জলের দূষণ কথা : জল বিভিন্নভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে কয়েকটি

এর পর ২ পাতায়

সাপের বিষের প্রতিষেধক

গোটা বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলিতে বিষধর সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যাটা খুব কম নয়। অনেকক্ষেত্রেই সাপের কামড়ের চিকিৎসা ফলপ্রসু হয় না। দেখা গেছে, আক্রান্ত মানুষ যদি সাপের বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গে সহনশীল (Immuned) হয় সেক্ষেত্রে উপসর্গগুলি প্রকাশ পেতেও সময় লাগে। ফলে আক্রান্তদের চিকিৎসাও সাফল্যের সঙ্গে করা সম্ভব। বলাবাহুল্য এই সাফল্য নিহিত রয়েছে একমাত্র প্রতিষেধক আবিষ্কারের মধ্যে।

প্রতিষেধক টীকার মূল উপাদান হিসাবে সাপের বিষকেই

এর পর ৫ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

বকনা বাছুর দুধ দিচ্ছে

বিশ্বাস : বকনা বাছুর বা কুমারী গরু গাভীন ছাড়াই অলৌকিক উপায়ে বা রাধারানির আবির্ভাবে দুধ দিচ্ছে বা গরু গাভীন হওয়ার আগেই দুধ দিচ্ছে।

বিজ্ঞান : এধরনের খবর প্রায়ই শোনা যায়। হাজার হাজার মানুষ তাদের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে রোগ সারানোর বা মনোবাসনা পূরণের আশায় ছোটে, ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

বকনা বাছুর বা কুমারী গরু বা গাইগরু গাভীন ছাড়াই দুধ দিতে পারে। এর মধ্যে অলৌকিকত্ব

এরপর ৬ পাতায়

জোনাকিরা জ্বলিতেছে

সন্ধ্যা। হিম হাওয়া। কোথাও খুব সম্ভব বৃষ্টি হয়েছে। শহর ছাড়িয়ে চলেছি। চারপাশে গাছগাছালির গায়ের গন্ধ, বেশ লাগছে। কাছে দূরে তালগাছ 'এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে'। দু-একটা ঘন ঝোপ পথের দুধারে। কিন্তু গাছের উপরে কে যেন কি যেন লটকে রেখেছে। আলো আঁধারিতে চশমা খুলে দেখি, এতো সেই বাবুই এর বাসা। স্মৃতি উথলে ওঠে মুহূর্তে

বাবুই পাখিরে ডাকি কহিছে চড়াই,
কুঁড়েঘরে থাকি করো শিল্পের বড়াই?

এরপর ৪ এর পাতায়

ভর নিয়ে ভারী কথা

ভর বস্তুর মৌলিক ধর্ম। যেকোন স্থানে বস্তুর ভরের কোন পরিবর্তন হয় না বলেই আমরা জানি। কোন বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ জড় পদার্থ থাকে সেটাই বস্তুর ভরকে নির্দেশ করে। কিন্তু বিজ্ঞানে পরীক্ষালব্ধ ভরকেই মানা হয়। ভর বিষয়টি অতীতকাল থেকেই বিজ্ঞানীদের ধারণার মধ্যেই ছিল। গাণিতিক পদ্ধতিতে ভরের মান নির্ণয় করে বিষয়টির ওপর গভীরভাবে ও ব্যাপক ও বিশেষভাবে আলোকপাত করেন স্যার আইজাক নিউটন।

এখন দেখা যাক নিউটন কিভাবে দুইরকম ভরের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞানী নিউটনের গতিসংক্রান্ত তিনটি সূত্রের কথা

এর পর ৬ পাতায়

অবাক পৃথিবী

১ পাতার পর

দূষণে সরাসরি আমাদের হাত থাকে। কয়েকটি দূষণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি দায়ী থাকে। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিকেও বিভিন্ন সময়ে দূষিত করে তুলেছি। যেমন ১৯৯১ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের (Gulf War) কারণে প্রায় ২০০ লক্ষ টন তেল সমুদ্রজলে ফেলে দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে ডিসেম্বর মাসে স্পেনের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে তৈলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনায় প্রচুর তেল সমুদ্রে মিশে যায়। ১৯৯৩ সালে ডিসেম্বর মাসে স্পেনের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে তৈলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনায় প্রচুর তেল সমুদ্রে মিশে যায়। ১৯৯৩ সালে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে বঙ্গোপসাগরে ডেনমার্কের একটি বড় তৈলবাহী জাহাজ অন্য একটি খালি জাহাজের সাথে ধাক্কা মারলে আগুন ধরে যায় এবং সেই কারণে জাহাজের সমস্ত তেল সমুদ্রে ফেলতে হয়। সমুদ্রে এইরকম দূষণ ঘটেছে বেশ কয়েকবার। এইভাবে সমুদ্রের জল দূষিত হলে সমুদ্রের ঐ অঞ্চলের সামুদ্রিক প্রাণী ও সামুদ্রিক মাছের জীবন বিপন্ন হবে।

আমাদের মিষ্টি জলের ভাণ্ডারও দূষিত হয়ে চলেছে। দূষিত করে তুলেছি প্রতিনিয়ত, বারবার। পানীয় জল আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার থেকে। প্রথমে দেখব **ভূপৃষ্ঠস্থ জল কি কি ভাবে দূষিত হচ্ছে**।

কয়েকটি সাধারণ দূষণ : কৃষিক্ষেত্রের সার ও কীটনাশক জলাশয়ে মিশে জল দূষিত করে তোলে। যেমন গঙ্গানদীতে প্রতিদিন গ্রামের চাষজমিগুলি থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ টন রাসায়নিক সার ও ৭ হাজার টন কীটনাশক এসে মেশে। এইভাবে শুধু গঙ্গায় নয়, অন্যান্য নদী, খাল, বিল ও জলাশয়ের জল দূষিত হচ্ছে।

বিভিন্ন শহরের পৌরআবর্জনা নদী ও বিভিন্ন জলাশয়ে মিশিয়ে দেওয়ার ফলে জল অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ছে। যেমন শুধু গঙ্গানদীতে প্রতিদিন বিভিন্ন শহরের পৌরআবর্জনা প্রায় ১৩ কোটি লিটার এসে মেশে। নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের জল হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক গুণমান।

বিভিন্ন কলকারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নোংরা জল ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ মিশিয়ে দেয় জলাশয়গুলিতে। শুধু গঙ্গানদীতেই প্রতিদিন বিভিন্ন কলকারখানা থেকে প্রায় ২৬ কোটি লিটার নোংরা জল নির্গত হয়ে মেশে। বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি (বিশেষত তাপবিদ্যুৎ) স্টীম উৎপাদনের মাধ্যমে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তাপীয় দূষণ সৃষ্টি করে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপন্ন তাপের খুব অল্পই কার্যে পরিণত হয়, অবশিষ্ট তাপ নষ্ট হয়। শীতক স্তম্ভে শীতক কুণ্ডলীকে শীতল করা হয় নিকটস্থ কোন নদীর (বা বড় জলাশয়ের) জল দিয়ে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ঐ উত্তপ্ত জল আবার ঐ নদীতে (বা জলাশয়ে) মিশিয়ে দেওয়া হয়।

জলে তেজস্ক্রিয় দূষক : জলে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশে জলকে দূষিত করে তোলে। বিভিন্নভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মিশতে পারে। যেমন, (ক) খনি থেকে তেজস্ক্রিয় মৌলের আকরিক উত্তোলনের সময় এবং মৌলের বিশুদ্ধ অবস্থা প্রস্তুতিকরণের সময় কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মেশে। (খ) পারমানবিক চুল্লী ও পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় দূষক জলে মেশে। (গ) ভূ-গর্ভে বা জলের নীচে পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা (ও ব্যবহার) করলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মেশে। (ঘ) কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (আইসোটোপ) প্রচুর ব্যবহারের ফলে।

সাধারণত যেসব তেজস্ক্রিয় দূষকগুলি জলে পাওয়া যায়, সেগুলি হল- Ra^{226}, Fe^{55}, K^{40}, Sr^{90}, Ba^{140}, Zn^{65}, Kr^{85}, Mn^{54}, I^{131}, U^{236} ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কিছু জলে অদ্রাব্য। অদ্রাব্য তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থিতিয়ে যায় এবং জলের নীচে পলিতে জমা হয়। বাকী কিছু দ্রাব্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ জৈব চক্রে (Biological Cycle) আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। এইসব তেজস্ক্রিয় দূষকগুলি বিভিন্নভাবে আমাদের বিভিন্ন ক্ষতি করে থাকে যেমন, (১) ঝিনুকের মধ্যে Zn^{65}, মাছের দেহে Fe^{55} জমা হয়েছে। কিছু কিছু জলজ প্রাণীর মধ্যে Sr^{90} তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। এই Sr^{90} এর তেজস্ক্রিয় প্রভাবে হাড়, দাঁতের ক্ষতি এবং অন্যান্য বিপাকীয় ক্ষতি (গোলযোগ) লক্ষ্য করা গেছে। (২) জলে অতি সামান্য পরিমাণে Ra^{226}, Th^{232} পাওয়া গেছে। এগুলি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বংশগতির গোলযোগ সৃষ্টি করে। বিকলাঙ্গ শিশু জন্মায়। (৩) জলে উপস্থিত অতি সামান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্যান্সার, লিউকোমিয়া, চোখের ছানি ইত্যাদি সৃষ্টি করে এবং DNA নষ্ট করে দেয়। তেজস্ক্রিয় আক্রান্ত ব্যক্তিদের শুধু নিজেদেরই ক্ষতি হয় না, এর ক্ষতিকর প্রভাব বংশানুক্রমে চলতে থাকে।

এগুলি জলের সাধারণ দূষণ, এই দূষণগুলি আমাদের ইচ্ছাতেই ভূ-পৃষ্ঠের জলে ঘটে থাকে, আমরা সতর্ক থাকলেই এই দূষকগুলিকে জলে মিশতে নাও দিতে পারি। আবার তেজস্ক্রিয় দূষকগুলি ছাড়া প্রায় সব দূষককেই আমরা সহজেই মুক্ত করতে পারি। এবার আর একটি দূষক দেখব, এটা সরাসরি আমাদের ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের ভাণ্ডারে ঘটেছে, পানীয় জলকে করে তুলেছে 'গরল'। 'আর্সেনিক দূষণ' জলে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি।

আর্সেনিক কি? আর্সেনিক (As) একটি মৌলিক পদার্থ। আরও এগিয়ে বললে, ইহা ধাতুকল্প। এর পারমানবিক সংখ্যাও ৩৩, পর্যায়সারণীতে (Periodic Table) এর অবস্থান চতুর্থ পর্যায়ও পঞ্চমশ্রেণী (VB)।

আর্সেনিক দূষণের উৎস : আর্সেনিক বিভিন্ন ভাবে জলে মিশতে পারে। সাধারণত সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন (১) **রাসায়নিক শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য:** বিভিন্ন শিল্পকারখানায় যথা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে, ওষুধ কারখানায়, রঙ ও কীটনাশক উৎপাদন কেন্দ্রে আর্সেনিক ধাতু বা যৌগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঐসব শিল্প কারখানা থেকে আর্সেনিক জলে মিশতে পারে বা মাটিতে সঞ্চিত হতে পারে। আর্সেনিক এভাবে ছড়াতে পারে শিল্পাঞ্চল গুলিতেই। (২) **কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার :** চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সারে ও

এরপর ৩ এর পাতায়

English Grammar Coaching Institute for Class IX - XII and Degree
Letter Marks Guarantee (Condition Apply) | Pass Marks Guarantee (No Condition)
Contact : T. PAUL
Mob : 9831422719
Nabanagar, Halisahar, North 24 Parganas

অবাক পৃথিবী

২ পাতার পর

কীটনাশকে আর্সেনিক থাকে। আর্সেনিক যৌগ হিসাবে আছে এমন সার জমিতে ব্যবহারের পর ঐ আর্সেনিক মাটিতে সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে ভূগর্ভের জলের সাথে মিশতে পারে। (৩) **ভূতাত্ত্বিক** : পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক দূষণের কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা এই কারণটিকে দাবী করছে। ভূগর্ভের জলকে অপরিকল্পিতভাবে, যত্রতত্র অতিরিক্ত পরিমাণে পানীয় জল তোলাই আমাদের এই ক্ষতির মুখে ঠেলেছে। প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভের জল তুলে নেওয়ার জন্য ভূগর্ভস্থ জলস্তর নীচে নেমে যায়। তখন ভূগর্ভে থাকা আর্সেনিক ঘটিত খনিজগুলির (আর্সেনোপাইরাইট, নিকেলাইন) সাথে অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। আর্সেনিক জলে দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। যেমন আর্সেনোপাইরাইট এর জারণের ফলে উৎপন্ন স্কোরোডাইট জলে দ্রাব্য। বর্ষাকালে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়লে ধাতব আর্সেনেট, আর্সেনাইট যৌগগুলি জারিত হয়ে জলের মধ্যে মিশে যায়। এইভাবে জলের মধ্যে আর্সেনিক এসে মিশছে।

আর্সেনিক কেন বিষ? আর্সেনিক আমাদের শরীরে বৃক্ক, যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদিতে সঞ্চিত হয়। তবে খুব অল্প পরিমাণে মল, মূত্র ও ঘামের সাথে নির্গত হয়। এছাড়াও হাত-পা-এর নখে ও মাথার চুলেও আর্সেনিক জমা হয়। আর্সেনিক আমাদের শরীরে প্রবেশ করেই প্রথমে যকৃৎকে আক্রমণ করে। যকৃৎ থেকে রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় অক্সিডেটিভ ফসফেট অন্তর্ভুক্তিকে আর্সেনিক বাধা দেয়। ফসফেটকে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। বিভিন্ন উৎসেচকের স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কালো ছিটছিটে দাগ, রুক্ষ ত্বক, গুটিদানা দেখা যায়, একে মেলানোসিস বলে। নখ, চুল বা ত্বক পরীক্ষা করে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা যায়। আবার যকৃৎ বা প্লীহাস্ফিতী, ত্বকে ঘা, হাতের তালু ফেটে যাওয়া, পায়ের তলা কেটে যাওয়া লক্ষ্য করা যায়। একে কেরাটোসিস (ক্যান্সার) বলে।

আর্সেনিক দূষণ কোথায় কেমন? পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ। এছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশ আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে। যেমন ১৯৬৪-১৯৬৫ সালের দিকে তাইওয়ানে প্রায় একলাখ মানুষ আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে। এছাড়াও আর্জেন্টিনার করডোবা অঞ্চল, আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্ক, চিলির আন্তফগোস্তা শহর, মেক্সিকোর লাগুনেরা, থাইল্যান্ডের কিছুটা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রদেশ, নিউজিল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশগুলিতেও বহু মানুষ আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাটি খুব বড়। বর্তমানে ৯টি জেলার (মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর) প্রায় ৭৬টি ব্লকে ও কলকাতার ৫টি অঞ্চলে প্রায় ২২ লাখ মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার।

কোথায় পাব আর্সেনিকমুক্ত জল? যেসব দেশ আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছিল প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরকারী উদ্যোগে খুব তৎপরতার সাথে দূষণমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং দূষণে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে সমস্যাটি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু প্রতিকারের কোন লক্ষণই নেই। শুধু গভীর নলকূপ বসানোর কাজ চলছে, যা এই সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষণ ঘটছে ভূগর্ভে সঞ্চিত আর্সেনিক খনিজগুলি থেকেই। তাই নিতে হবে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। যেমন— (১) পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর গড়ে যে ২০০০ মিলি মিটার বৃষ্টি হয় তার পুরো জলটাই ধরে রাখতে হবে। জল শোধনাগারে শোধন করে জল সরবরাহ করতে হবে। উদ্বৃত্ত জল চাষ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। মাটির নীচের (ভূগর্ভের) জল তোলা বন্ধ করতে হবে। (২) যত্রতত্র গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে। (৩) নদী ও অন্যান্য সব জলাশয়গুলির গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে, মজানদী পুনরুদ্ধার করা দরকার। নদী ও সকল জলাশয়ের গভীরতা বাড়াতে পারলে জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে। এই জল পরিশোধন করে পানের যোগ্য করে তোলা যাবে। (৪) ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণগত ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক, কারিগরী পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে ভূগর্ভস্থ জলের স্বাস্থ্য ফিরে আসে। জীবকুলের টিকে থাকার স্বার্থে, সুস্থ থাকার জন্য, জলের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের সকলকে এই পদক্ষেপগুলি কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলে যত ছোট-বড় জলাশয় আছে, সবরকম জলাশয়ের (পুকুর, খাল, বিল, বাঁওড়) জলধারণ ক্ষমত বাড়িয়ে তুলতে হবে। জলাশয়ের বহুমুখী উপযোগিতার কথা মাথায় রেখে জলাশয় সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে বিভিন্ন অজুহাতে এবং উন্নয়নের দোহাই দিয়ে জলাশয় বুজিয়ে শহর উন্নয়ন চলছে এবং ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ, তৈরী হচ্ছে জলসঙ্কট। জলসম্পদ তথা পরিবেশ বাঁচানোর জন্য, পরিবেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য, বাঁচাব জলাশয়গুলি, বাঁচাব জলসম্পদ, বন্ধ করব আমাদের তৈরী জলদূষণ, বাঁচব আমরা, বাঁচবে জীবজগৎ, বাঁচবে পৃথিবী।

পান্নালাল মানি, বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া।

<u>বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন</u>। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন। মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই পাঠাবেন।

H.P. GAS
(A Govt. of India Enterprise)
HP GAS your friendly gas
By Hindustan Petroleum Corpn. Ltd.
Distributor
Kanchrapara H.P. Gas Service
30, Rajani Babu Rd., Kanchrapara
Ph: 2585-5221
(New Connection available here Rs. 1850 only, including Oven, Accessories & Insurance)

জোনাকিরা জ্বলিতেছে

১ পাতার পর

কিন্তু বাবুই এর বাসার ভেতরে কে জ্বালিয়ে রেখেছে আলো? জ্বলছে নিভছে। আমি তো অবাক। পাশের বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানালোঃ বুঝলি না, বাবুই শুধু শিল্পী পাখিই না, সৌখিনও কম নয়। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশানের জন্য ধরে এনেছে রাতের জোনাকি।

বাবুই বাসার ভেতরে জোনাকি জ্বলছে। এমন দৃশ্য এখনো আজো কোথাও কোথাও দেখা যায়। জোনাকি জ্বলছে কেন? কেমন করেই বা জ্বলছে, ভাবতে ভাবতে মাস্টারমশাই এর কথা মনে পড়ে। জৈব রাজ্যে কেবল জোনাকিই নয়, অনেক ছত্রাক আছে, অনেক ব্যাকটেরিয়া আছে, আছে অনেক সামুদ্রিক মাছ, যাদের শরীর থেকে ঠিকরে বেরোয় আলো। কখনো সেই আলো রাত ল্যাম্পের মতো হালকা ঠাণ্ডা নীল, কখনো সে আলো রীতিমতন জীবনানন্দীয় অর্থাৎ হেমন্তের সবুজ রোদের মত আলো। কখনো তা পাকা লেবুর মতন সজ্জে হলুদ। ফ্লুরোসেন্ট বাতির ঠাণ্ডা আলোর সঙ্গেই কেবল এর তুলনা টানা যেতে পারে।

তো, এটা কেমন করে হয়? ঐসব উদ্ভিদ (ব্যাকটেরিয়া) বা প্রাণীরা নিশ্চয়ই ম্যাজিক জানে। নাহ্ মোটেও তা নয়। আসলে যারা এরকম নিজের অঙ্গে আলোর বিভঙ্গ আনতে জানে, তাদের এক কথায় বলা যায় জৈব জ্যোতি বিচ্ছুরণশীল জীব। ঠিকইতো, সাদা ভাষায় বলা যায় জীব কর্তৃক আলো উৎপাদন আসলে তাপশক্তি আলোক হিসেবে ছড়িয়ে পড়ছে। আর এই ছড়িয়ে পড়ার পেছনে কলকাঠি নাড়ছে 'লুসিফেরিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। অবিশ্যি অক্সিজেন তো থাকতেই হবে। এছাড়াও আছে ভাল, অজৈব কিছু আয়ন আর ATP (অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট) নামক শক্তি সঞ্চয়ী যৌগ। অবিশ্যি এদের প্রত্যেকের ক্রিয়া বিক্রিয়ার মধ্যে যদি না 'লুসিফেরেজ' নামক উৎসেচক উস্কে দেবার কাজ করতো তবে আর জোনাকি জ্বলতো না। জ্বলতো না জেলিফিস। হ্যাঁ জেলিফিশও জ্বলে বটে। তবে প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো যে জেলিফিশ প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ২০১১ ফোটোন কণিকার মত জ্বলে। কখনো বা এক সেকেন্ডের ১ দশমাংশ সময় মাত্র। মাইকেল যাকে বলেছেন, 'ক্ষণপ্রভা আলো' আবার কখনো আলোক-সংশ্লেষকারী ডায়ানোফ্লাজেলেটদের শরীর থেকে ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মতন চকিত বিচ্ছুরণ হতে দেখা যায়। এর আবার ধরণ অন্যরকম। গত দিনের সূর্যের আলোর তীব্রতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল এর বর্তমান দিনের বিচ্ছুরণ। যত বেশী উজ্জ্বল সূর্যালোক তত বেশী উজ্জ্বলতর বিচ্ছুরণ। তবে হ্যাঁ এই বিচ্ছুরণও ক্ষণমাত্র। মাত্রই ০.১ সেকেন্ড স্থায়ী হতে দেখা যায়। বিশেষ করে অন্ধকারে অভিযোজিত বা ধাতস্থ হওয়া চোখে কেবল এই বিচ্ছুরণ ধরা পড়ে। নইলে নয়। কোন কোন জীব অবশ্য টানা বিছুক্ষণ বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ জীবেরই বিচ্ছুরণের দৌড় মাত্র ০.১ সেকেন্ড থেকে ১০ সেকেন্ড। তবে কিছু ডায়ানোফ্লাজেলেট কোন বিশেষ উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার জন্য বারবার জ্বলে উঠতে পারে। কোন কোন বহুকোষী প্রজাতির মধ্যে এই বিচ্ছুরণ স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরকমভাবেই কোন কোন সামুদ্রিক মাছ সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম তথা নর-অ্যাড্রেনালিন নামক নিউরোট্রান্সমিটার দ্বারা এই বিচ্ছুরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

বলছিলাম জোনাকির কথা। জোনাকিতে অবশ্য ঐ ট্রান্সমিটারটির নাম গ্লুকামেট। যদিও সামুদ্রিক কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ভেতরে বিচ্ছুরণের জন্য দায়ী ট্রান্সমিটারটির খবর এখনো অজানা বিজ্ঞানী মহলে।

কোন কোন নিডেরিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীর শরীরে আবার সবুজ ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিন আছে যা সমুদ্রের আপাত নীলকে সবুজে বদলে নেয়। কোনো কোনো সামুদ্রিক মাছেরও এই 'বদলে নেবার ক্ষমতা' আছে। নীলকে রক্তবর্ণ (যাতে ভয় পায়) করে নিয়ে ওরা দিব্যি শিকার ধরতে বেরোয় জলের অতলে। খাদ্যের সন্ধানে প্রকৃতি রাজ্যে কতোই না ছলাকলা কৌশল। ভাবতে অবাক লাগে।

নীল সবুজ হলুদ যাই বলি না কেন, যেকোনো রকম জৈবজ্যোতির মূল উপাদান কিন্তু লুসিফেরিন। ব্যাকটেরিয়ায় যে লুসিফেরিন আছে তা আসলে বিজারিত রাইবোফ্লাভিন ফসফেট ($FMNH_2$)

ডায়ানোফ্লাজেলেটে প্রাপ্ত লুসিফেরিন অবিশ্যি মনে করা হয় ক্লোরোফিল থেকেই এসেছে।

সিলেন্টারাজাইল হচ্ছে সামুদ্রিক লুসিফেরিনদের মধ্যে সব চাইতে বেশী পরিচিত। বিভিন্ন পর্বের প্রাণীদের শরীরেই এটি পাওয়া যায়।

ফিরে আসি আগের কথায়। জোনাকির পুচ্ছে যে আলো জ্বলে, যে আলোয় বাবুই পাখিটি তার কুঁড়েঘর আলো করে রাখে, তা আসলে জোনাকির ভেতরে জন্মগত আলো। লুসিফেরিন বা অন্য যে নামেই ডাকি না কেন, যতই তাকে বেঁধে ফেলি না কেন ATP'র সাথে অজৈব আয়ন সহযোগে অক্সিজেনের সঙ্গে লুসিফেরেজ নামক উৎসেচক যতই তাকে ADP এবং জল বানাতে সাহায্য করুক, এগুলি ছাড়াও সে কিন্তু আলো ছড়াবেই। আলোই তার উদ্দেশ্য, আলোই তার বিধেয়।

বাবুই বাসায় গোবরের ছোট্ট, তালের উপরে জোনাকি শরীর দেখে মনে কি হয় না উৎসর্গীকৃত আলোকিত প্রাণের প্রতীক? মানুষের ভেতরেও তো এরকম কত্রে 'জোনাকি মানুষ' আছে। আমরা তাদের চিনেও চিনি না। অবিশ্যি তাতে কি এসে যায়? ওরা তো স্বয়ংপ্রভ মানুষ।

—জগন্ময় মজুমদার
শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তিচরণ উচ্চ বিদ্যালয়। ফোন ২৫৮৬-৬৪৩৭ (বাড়ি)

© 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of
India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

পড়ুন ও পড়ান
গণবিজ্ঞানবার্তা
উৎস মানুষ
জ্ঞান ও বিজ্ঞান
কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
টপকোয়ার্ক
মাসিক গণস্বাস্থ্য
প্রগতিবার্তা

সাপের বিষ

১ পাতার পর

বিষক্রিয়া রোহিত করে ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে সংগৃহীত সাপের বিষকে গামারশ্মি দ্বারা বিকিরণ করলে উপাদানটির বিষক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং উক্ত উপাদানের প্রতিরোধী ক্ষমতা শরীরে আত্মপ্রকাশ করে। বিষক্রিয়াহীন এই উপাদান প্রয়োগের ফলে প্রাণী দেহে সাপের বিষের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই উপাদানটিকে সাপের বিষের প্রতিরোধক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

গামারশ্মি বিকিরণকৃত চন্দ্রবোড়া সাপের বিষের টীকা বা ভ্যাকসিন বাঁদরের শরীরে ৩০দিন অন্তর তিনবার প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে ১৪টির মধ্যে ৯টি বাঁদরই বেঁচে রয়েছে। শুধু তাই নয়; মৃত ৫টি বাঁদরের মৃত্যুর কারণ সাপের বিষ প্রয়োগজনিত ঘটনায় হয়নি—হয়েছে অপ্রধান সংক্রমণে। তাই এই পরীক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের আশা দেখিয়েছে তেমনি উন্মুক্ত করেছে আরও বিশদ ও সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার।

পরীক্ষাগারে প্রথমে চন্দ্রবোড়া সাপের বিষকে ০.৯ শতাংশ স্যালাইনে (১ মিলিগ্রাম/মিলিলিটার) মিশ্রিত করা হয়। এরপর ২০°-২২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দ্রবণটিকে ৬০সি আইসোটোপ (গামা চেম্বার ৯০০, আইসোটোপ ডিভিশন, বার্ক ট্রম্বে, মুম্বাই) থেকে বিকিরণকৃত করা হয়। দ্রবণটিতে ৮ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ধরে মোট ১০০ কিলো র‍্যাড প্রয়োগ করা হয় যাতে সেটি সম্পূর্ণরূপে বিষমুক্ত হয়। দ্রবণটিকে বিষমুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি ডিভিশন, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বিধাননগর, কলকাতা। এরপর এম এল ডি (MLD) এবং এল ডি ৫০ (LD50) নির্ণয় করা হয় বিষযুক্ত ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে। এর মান গণনা করা হয় প্রোবিট অ্যানালিসিস (ফিনে, ১৯৭১) পদ্ধতিতে। সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে ৪বার পুনরাবৃত্তি করা হয়।

পরীক্ষার জন্য একই ওজনের (২০ গ্রাম মতো) নেওয়া ইঁদুরগুলিকে ৩০দিন অন্তরে মোট তিনবার ৪০ মাইক্রোলিটার/২০ গ্রাম) ডোজের প্রতিষেধক টীকাটির ইঞ্জেকশন (i.p) দেওয়া হয়। তৃতীয় ইঞ্জেকশনের ৩০দিন পর একই ডোজের বিষযুক্ত ইঞ্জেকশন (i.p) ইঁদুরগুলির ওপর প্রয়োগ করা হল। প্রতিটি ইঞ্জেকশন দেওয়ার ৩০ দিনের মাথায় প্রয়োজন অনুযায়ী ইঁদুরের অপটিক ভেন (চোখের শিরা) থেকে রক্ত নেওয়া হয়। সংগৃহীত রক্তকে ৫০০০ আর পি এম (r.p.m)-এ ১০ মিনিট সেন্ট্রিফিউজ করে সিরাম সংগ্রহ করে (-) ২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হল পরবর্তী ব্যবহারের জন্য। এরপর সংগৃহীত রক্তের সিরামের এলাইজা পরীক্ষা বারংবার করা হয়। এলাইজা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল নিম্নরূপ:

(১) প্রথম ইঞ্জেকশনের ৩০ দিন পর—

সিরাম জলীয়করণ	পরীক্ষালব্ধ ইঁদুরের IgG মাত্রা
১:৫০	০.৪৬৫
১:১০০	০.১৪১

(২) দ্বিতীয় ইঞ্জেকশনের ৩০ দিন পর—

সিরাম জলীয়করণ	পরীক্ষালব্ধ ইঁদুরের IgG মাত্রা
১:৫০	০.৬২৮
১:১০০	০.২২৬

(৩) তৃতীয় ইঞ্জেকশনের ৩০ দিন পর

সিরাম জলীয়করণ	পরীক্ষালব্ধ ইঁদুরের IgG মাত্রা
১:৫০	০.৬২৮
১:১০০	০.২২৭

এই পরীক্ষাটি এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র ইঁদুরের ওপরই করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রাণীর ওপরেও এই পরীক্ষা চালানো তাই একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ইঁদুরের ওপর চালানো পরীক্ষা থেকে যদিও এখন্য জানা যায়নি—প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক কবে থেকে শুরু হয় এবং কতদিন বা মাস পর্যন্ত তা কার্যকরী থাকে অথবা তার বিস্তৃতিই বা কতটা। পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে, প্রতিটি ইঞ্জেকশনের পর IgG মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং সর্বাধিক হয় শেষ ইঞ্জেকশনের ৩০ দিন পর। লক্ষ্যণীয় যে, বর্ধিত IgG টিই সাপের বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার মূল কারিগর। পাশাপাশি এই পরীক্ষা থেকে এখনও পর্যন্ত IgG মাত্রা নিরূপণ করা হয়নি—ভবিষ্যৎ পরীক্ষার ক্ষেত্রে যা একান্ত অবশ্য করণীয় কাজ। শুধু তাই নয়, এই পরীক্ষা আমাদের টীকার কার্যকারিতা, প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রা, সময়সীমা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে—ভবিষ্যতে মানুষের ওপর প্রয়োগের আগে যা কিনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়।

গবেষক : শ্রাবণী তালুকদার, ডাঃ হিরন্ময় মুখার্জি, গুরুদাস দাস, সুনীল চন্দ্র দাস, ডাঃ অমিয় কুমার হাটি,

যোগাযোগ : *Dept. of Medical Entomology, School of Tropical Medicine, Govt. of W.B. C.R. Avenue, Kol-73*

সাপের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা

ভয় পাবেন না, ভয় পেতে দেবেন না—কারণ ভয়েই বেশীরভগ রোগী মারা যায়। ১। রোগীকে আশ্বস্থ করে শান্তভাবে শুইয়ে রাখুন। ২। রোগীর মনোবল বাড়াতে ক্ষতস্থানের একটু উপরে হালকা বাঁধন দিন। ৩। ক্ষতস্থান বারবার ক্ষারযুক্ত সাবান জলে ধুয়ে ফেলুন।

বিষধর হলে : রোগীকে শান্তভাবে শুইয়ে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এবং চিকিৎসার (AVS) ব্যবস্থা করতে হবে।

বিষহীন হলে : ১। রোগীর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে ভেঙে থাকা দাঁত থাকলে তুলে ফেলুন। ২। ক্ষতস্থান ডেটল/স্যাভ্লন দিয়ে পরিস্কার করে টিটেনাস ইনজেকশন দিন।

<u>অ্যান্টি ভেনাম সিরাম কিভাবে দেওয়া হয় :</u>

১। বিষধর সাপে কামড়ালে অ্যান্টি ভেনাম সিরাম (AVS) নরম্যাল স্যালাইন এর মিশিয়ে শিরার মাধ্যমে (I.V. inj.) ফোঁটা ফোঁটা করে দিতে হবে। ২। সকলের ক্ষেত্রেই একই মাত্রা প্রয়োগ করা হয়। ৩। বিষক্রিয়ার লক্ষণ থাকলে ১ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ মিলি লিটার (10ml x 10 amp) দেওয়া হয়। প্রথমে ধীরে ধীরে পরে রুগীর অবস্থা বুঝে মাত্রা নির্ণয় করা হয়। ৪। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী একইভাবে ৩০০-৪০০ মিলি লিটার বা তার বেশী প্রয়োগ করা হয়।

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

New Dynamic Engineer's Co-Society Ltd.
Govt. Contractors
354, Siraj Mondal Rd.
Kanchrapara. Ph: 2585-9243

বকনা বাছুর

১ পাতার পর

বলে কিছুই নেই। বাকনাবাছুর বা গাইগরু স্তন্যপায়ী প্রাণী সাধারণত দুগ্ধবতী হয় তাঁর কারণ স্তন্যপায়ীর দেহের স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টরন হরমোনের জন্য। স্তনগ্রন্থি থেকে দুধ নিঃসরণের ল্যাকটোজেনেটিক হরমোন (LTH) বা প্রল্যাকটিন্ হরমোন (PLH) সাহায্য করে। এই হরমোনের অধিকক্ষরণ হলে যেকোন সময়েই স্তন্যপায়ী প্রাণীকে দুগ্ধবতী করে তোলা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন গ্রন্থিগুলি বা যৌন লক্ষণগুলি সময়ের আগেই পূর্ণবিকাশ ঘটে।

সরকারী বা বেসরকারী লাইভস্টক /প্রাণী খামারে বহুক্ষেত্রেই ল্যাকটোজেনেটিক বা প্রল্যাক্টিন হরমোন বন্ধাগরু বা বকনা গরুর দেহে ইনজেকশন দিয়ে দুধ দোয়ানো হয়। এক্ষেত্রে দুধের গুণগতমানের সাধারণভাবে কোন হেরফের ঘটে না, কারণ দুধ হরমোন গ্রন্থির নিঃসরণের ফলেই পাওয়া যায়। Milk is nothing but a lactical secreation.

বিশ্বাস আছে যে এই দুধ পান করলে প্রায় সব রোগই সেরে যাবে। বিষয়টা পুরোপুরি ধাপ্পাবাজি। বরং উল্টোভাবে বলা যায়, কাঁচা দুধ পান করলে রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গরুর যদি টিউবার কুলোসিস অর্থাৎ টিবি রোগ থাকে, সেইক্ষেত্রে গরুর দুধেও টিবি রোগের জীবাণুর (ব্যাকটিরিয়াম টিউবার কুলোসিস) সংক্রমণ ঘটে। এক্ষেত্রে গরুর দুধ সর্বদাই জীবাণুমুক্ত করে পান করতে হবে। তাই গরুর দুধকে পাস্তুরাইসড বা (স্টেরিলাইসড় বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও সময়ের মধ্যে (160°F তাপমাত্রা, সময় ১৫ সেকেন্ড) রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে দুধ শতকরা ১০০ ভাগ জীবাণুমুক্ত হয়।

তাই কাঁচা দুধ বা দুধ ও জলের মিশ্রণ বা বিশেষ কোন ধর্মীয় স্থানের চরণামৃত কখনই পান করা উচিত নয়। এতে রোগ সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কারণ ঐ চরণামৃতে টিউবার কুলোসিস রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশী। তাই দুধ বা দুধ ও জলের মিশ্রণ সবসময়ই জীবাণুমুক্ত করে ভালো করে ফুটিয়ে বা পাস্তুরাইসড করে সর্বদা পান করতে হবে।

তাই কুমারী গরু বা গাইগরু গাভীন ছাড়াই দুধ দিতে পারে, এর মধ্যে অলৌকিকত্ব বলে কিছুই নেই, শুধুমাত্র হরমোন প্রয়োগ করেই এদের দুগ্ধবতী করে তোলা যায়। *—জয়দেব দে*

ভর নিয়ে ভারী কথা

১ পাতার পর

আমাদের সকলেরই জানা। দ্বিতীয় গতিসূত্রে তিনি দেখান কোন নির্দিষ্ট ভরসম্পন্ন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করতে থাকলে বস্তুটির মধ্যে ত্বরণ সৃষ্টি হয়। বস্তুর ভর আর সৃষ্ট ত্বরণের গুণফলই হল বস্তুর ওপর ক্রিয়ার ও বলের মান। অর্থাৎ বল = ভর x ত্বরণ। তাহলে এও বলা যায় ভর = বল ÷ ত্বরণ। এই ভর হল বস্তুর জড়ত্বীয় ভর। অভিকর্ষ বলের কথা বলতে গিয়ে তিনি দেখান যে পৃথিবীর আকর্ষণ বল বস্তুর ভরের সমানুপাতিক সুতরাং বলা যায় অভিকর্ষ বল = ধ্রুবক x ভর। এই ভরকে বলে মহাকর্ষীয় ভর। উল্লেখযোগ্য বিষয়টা হল, নিউটন তখন বলেননি জড়ত্বীয় ভরই বা কি আর মহাকর্ষীয় ভরই বা কি। তবে তিনি এটা বলেছিলেন, বস্তুর ভর বস্তুর গতিবেগের ওপর নির্ভর করে না। জড়ত্বীয় ভর আর মহাকর্ষীয় ভর নিয়ে তারপর কেউ গভীরভাবে ভাবেননি।

ভাবলেন বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি ভর সম্পর্কে যুগান্তকারী সব তত্ত্ব পেশ করলেন। তিনি ১৯০5 সালে একটা-দুটো নয় চারটে গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। সেই বছরটাকে স্মরণে রেখে ২০০৫ সালকে 'বিশ্ব পদার্থ বিদ্যা বর্ষ' (World year of physics) ঘোষণা করা হয়। তৃতীয় গবেষণাপত্রটির নাম ছিল 'On the electrodynamics of moving bodies'. এখানেই আছে তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (Special Theory of Relativity)। এই গবেষণাপত্রেই তিনি বস্তুর 'আপেক্ষিক ভরের' কথা বলেন। তিনি বললেন বস্তুর ভর অপরিবর্তনশীল নয়। বস্তুর গতিবেগ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার ভরও বৃদ্ধি পায়। তবে গতিবেগ বৃদ্ধি বলতে আমরা যা বুঝি তাতে বস্তুর ভরের কোন হেরফের হয় না। গতিবেগ বাড়তে বাড়তে যদি আলোর গতিবেগের (সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) কাছাকাছি যেতে পারে তবে বস্তুটির ভরের পরিবর্তন হবে লক্ষ্যনীয়। কোন বস্তু যদি আলোর গতিবেগ লাভ করতে পারে তবে তার ভর হবে অসংজ্ঞাত। তাহলে বলা যাচ্ছে স্থির অবস্থায় থাকা বস্তুর ভরকে বলে জড়ত্বীয় ভর। আর বস্তু যখন গতিশীল অবস্থায় থাকে তখন তার ভর হয় আপেক্ষিক। আইনস্টাইন বস্তুর ভর নিয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করলেন। এই বছরই এই গবেষণাপত্রেই তিনি একটি সমীকরণ প্রকাশ করেন। সেটি ছিল ভর আর শক্তির অভিন্নতা পরিচায়ক সমীকরণ। আবারও ভর আর শক্তির প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিলেন তিনি। সমীকরণটি হল $E=mc^2$ যেখানে E শক্তি, m ভর c আলোর গতিবেগকে নির্দেশ করছে। তিনি বললেন কোন বস্তুর ভর ভাঙলে যেমন শক্তি উৎপন্ন হয় তেমনই শক্তিকে একত্রীভূত করলে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ভর উৎপন্ন হয়। এইসময় তিনি একটি অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্তে আসেন যে আলোরও ভর আছে। $E=mc^2$ সমীকরণ থেকে বলা যেতে পারে বস্তুর ভর যেমন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আবার কোন বস্তুতে শক্তি যোগ করলে বস্তুর ভর বেড়ে যাবে। কোন কারণে বস্তুর ভর যদি কমে যায় তাহলে বস্তুতে সঞ্চিত শক্তি কমে যাবে। যে পরিমাণ শক্তি পূর্বের তুলনায় কমে যায় তা অবশ্যই অন্য কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। তাই আপাতদৃষ্টিতে বস্তুর ভর আর শক্তি পৃথক বলে মনে হলেও এরা মূলত একই।

১৯০৫ সালেই আইনস্টাইন থেমে যান নি। নিউটন ভর নিয়ে যেকাজ করে গিয়েছিলেন আইস্টাইন তার পূর্ণতা দান করেন। প্রথমেই জড়ত্বীয় ভর আর মহাকর্ষীয় ভরের কথা বলা হয়েছে। এই ভর যে সমান সে ধারণা একেবারে যে ছিল না তা নয়। আইনস্টাইন প্রমাণ করে দেখালেন এই দুই ভর সমান। বিজ্ঞানী ইয়টভস (Eotvos) ১৯০৯ সালে পরীক্ষা করে দেখালেন জড়ত্বীয় ভর আর মহাকর্ষীয় ভর সমান। তাঁর পরীক্ষার ফল-এ ভুল ছিল একশ কোটি ভাগের এক ভাগ। ১৯৬৯ সালে আবার বিজ্ঞানী ডিকে (Dicke) উন্নত মন্ত্র ব্যবহার করে দেখান দুই ভরের মান একই। নিউটনের গতিসূত্রে দেখা গেছে জড়ত্বীয় বল = ভর x ত্বরণ। বা ত্বরণ = জড়ত্বীয় বল ÷ ভর। কোন বস্তুর ওপর ধরা যাক অভিকর্ষীয় বল কাজ করছে। তাহলে, ত্বরণ = জড়ত্বীয় বল ÷ ভর

= অভিকর্ষীয় বল ÷ ভর

= ধ্রুবক x ভর ÷ ভর = ধ্রুবক

দেখা যাচ্ছে কোন বস্তুর ওপর অভিকর্ষীয় বল কাজ করলে বস্তুটি একই ত্বরণ (ত্বরণ = ধ্রুবক) নিয়ে চলে। অভিকর্ষীয় বলের প্রভাবে উপর থেকে নীচে পড়ার সময় যেকোন ভরের বস্তু সমান ত্বরণ নিয়ে অর্থাৎ একই সময়ে মাটি স্পর্শ করবে। তবে বস্তুটির ওপর অভিকর্ষীয় বল ছাড়া অন্য কোন বল কাজ করলে হবে না। এই ঘটনাই বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রমাণ করার জন্য অ্যারিস্টটলের তথ্যকে ভুল বলে প্রমাণিত হয়। খ্রীস্টপূর্ব তিন শতকে অ্যারিস্টটল ভর সংক্রান্ত তাঁর অনুমিত তথ্য দেন। খ্রীস্টের জন্মের পর পনেরোর শতকে গ্যালিলিও সেই তথ্যকে শেষ করে দিলেন। ষোল-র শতকে নিউটনের গ্যালিলিও'র ভর সম্পর্কিত মতকে গাণিতিক সূত্রে বাঁধলেন। আইনস্টাইন ভর বিষয়টির পূর্ণ ও অখণ্ডনীয় ব্যাখ্যা দিলেন। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভরের ধারণা প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হল। *—কাকলি সরকার*

এক নজরে বিভিন্ন বিষধর ও বিষহীন সাপের কামড়ের পার্থক্য

সাপের বিবরণ			ক্ষতস্থানের অবস্থা			বৈশিষ্ট্য
সাপের নাম ও বিষের মাত্রা	গড় মৃত্যুর সময়	বৈশিষ্ট্য	দাঁতের দাগ	রক্ত চোয়ানো	যন্ত্রণা (অবস্থা)	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
গোখরো ও কেউটে (কোবরা) ১৫ মিলি গ্রাম (নিউরোটক্সিন)	৮ ঘণ্টা	ফনাধর সাপ, ফনার পিছনে 'U' যুক্ত—গোখরো। ফনার পিছনে 'O' চিহ্নযুক্ত—পদ্মকেউটে।	১ ইঞ্চি দূরত্বে দুটি দাঁতের দাগ 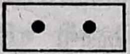	রক্তরসের সঙ্গে চোঁয়ানো রক্ত (কালচে) বার হয়। সহজে বন্ধ হয় না।	কামড়ের বেশ কিছুক্ষণ পর (১-২ঘণ্টা) যন্ত্রণা শুরু হয়; যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতস্থান ফুলতে থাকে।	
কালাজ ১ মিলি গ্রাম (নিউরোটক্সিন) ক্রেট	১০-১২ ঘণ্টা	ফনাহীন, ছোট মাথা, রোগাটে দেহ, রঙ কালো বা বাদামী। তারওপরে জোড়া শাঁখার দাগ।	ঐ	ঐ	যন্ত্রণা হয় না। ক্ষতস্থান স্বাভাবিক থাকে।	অনেক দেরীতে লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরে দ্রুত রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে। ৫-৬ ঘণ্টা পরে গাঁট ও পেটে ব্যাথা হতে পারে। রাত্রে বিছানায় বেশীরভাগ কামড়ের ঘটনা ঘটে।
শাখামুটি (ব্যান্ডেড ক্রেট) ১০ মিলি গ্রাম		ফনাহীন সাপ, সারা দেহে ১ ইঞ্চি চওড়া চওড়া হলুদ কালো ব্যান্ডযুক্ত	ঐ	ঐ	ঐ	কামড়ের ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড ঘুম পায়। ঘুমের মধ্যে মুখ বিড়বিড় করে, যেন কিছু বলতে চাইছে। এই ঘুমই শেষ ঘুম হয়। **আমাদের দেশে এই সাপের কামড়ের ঘটনার কোনও নজির পাওয়া যায়নি।**
চন্দ্রবোড়া রাসেল্‌স ভাইপার) ৪২ মিলি গ্রাম হেমাটোটক্সিন	৭২ ঘণ্টা	ফনাহীন, মোটাসোটা চেহারা, তেকোনা মাথা, দেহ চন্দন হলুদ, গোল গোল চাঁদের ছাপ।	ঐ	ঐ	তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয় এবং অসহ্য হয়ে ওঠে, ফুলতে থাকে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফোস্কাও পড়তে থাকে।	দেহের ভেতরে ও চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ বা হেমারেজ হয়। থুতু, বমি, মল, মূত্রে রক্ত দেখা যায়। রক্তের হিমোগ্লোবিন (লোহিত রক্ত কণিকা) ভেঙে যায়।
বিষহীন			অর্ধচন্দ্রাকারে অনেক দাঁতের দাগ থাকে। 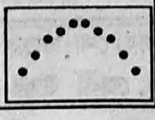	টাটকা লাল রক্ত বের হয়। একটু পরেই জমাট বেঁধে যায়।	যন্ত্রণা হয় না। সামান্য জ্বালা করে। ক্ষতস্থান স্বাভাবিক থাকে।	কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। (১) চোখের ওপরের পাতা ঝুলে পড়ে না। (২) নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে না।

কৃতজ্ঞতা : ক্যানিং বিজ্ঞান তৃষ্ণা

কাঁপা হাইস্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

বিজ্ঞানদরবার সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় ১৩-১৪ আগস্ট, ০৫ কাঁপা হাইস্কুলে (কাঁপা-চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা বীজপুর, বারাকপুর ব্লক- ১, উত্তর ২৪ পরগনা) দুদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞান প্রদর্শণী, আলোচনাচক্র ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রদর্শণীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভাগ আর্থিক সহযোগিতা করেন। কাঁপা হাইস্কুলের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দুদিনের এই বিজ্ঞানপ্রদর্শণী খুবই আকর্ষণীয় ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

১৪ আগস্ট বিজ্ঞান প্রদর্শণীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও স্কুলের সম্পাদক সলিল কুমার দত্ত মহাশয় ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শঙ্কর কুমার শিকদার। স্কুলে প্রতিটি শিক্ষক শিক্ষিকাই প্রদর্শনীতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

সংস্থার সম্পাদক জয়দেব দে ও সভাপতি প্রতুল কুমার দাস প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে বিজ্ঞানের প্রতিটি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও কার্যকারণসম্পর্ক সকলকে বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ করেন।

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান কক্ষটির নামকরণ করা হয়েছিল 'ডঃ আব্রাহাম কোভুর বিভাগ' / আগুন খাওয়া, বিনা আগুনে যজ্ঞ, পেরেকের বিছানায় বিনা ব্যাথায় শুয়ে থাকা, মরারখুলি সিগারেট খাওয়া সহ প্রতিটির বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণগুলি হাতে কলমে করে দেখানো হয়, পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অলৌকিক নয় বিজ্ঞান বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। 'বিজ্ঞানের মজা' প্রদর্শণীটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোস বিভাগ নামকরণ করা হয়েছিল। হাতে কলমে বিজ্ঞান করে দেখো যেমন : না ধরে বরফ তোলা, জল পড়ছে না কেন, রুপোলী ডিম কালো হয়ে গেলো', আগুন ছাড়াই জল ফোটানো, ফু না দিয়ে মোমবাতির শিখা নেভানো, জলে ডিম ভেসে থাকা, সহজে ছবি ছাপানো'—এরকম প্রায় ২০টি বিজ্ঞানের মজা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান দরবারের সহযোগিতায় হাতে-কলমে ও চার্ট ও ছবির সাহায্যে দর্শকদের বুঝিয়ে দেন। বিজ্ঞানের প্রতিটি কার্যকারণ সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা সহ বুঝিয়ে দেন।

খাদ্যে ভেজাল, রঙীন খাবার : কিভাবে ধরবেন শীর্ষক প্রদর্শনীটির নামকরণ করা হয়েছিল ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নামে। রঙীন খাবার বর্জন করে প্রাকৃতিক রঙীন খাবার খাওয়া উচিৎ। পাশাপাশি খাদ্যে ভেজাল (চা, মুড়ি, ঘি, কফি, দুধে) হাতে কলমে ধরার সহজ উপায়গুলি ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান গবেষণাগারের মাধ্যমে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে খাদ্যে ভেজাল হাতে-কলমে কর্মশালার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা প্রশিক্ষণ দেন। **ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থার** সদস্যরা খাদ্যে ভেজাল—রঙিন খাবার বিষয়ক প্রদর্শনীতে সহযোগিতা করেন।

রঙীন আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানকর্মীরা **মহাকাশ, পরিবেশ, আর্সেনিক ও জলদূষণ** বিষয়ক বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে বিজ্ঞানকর্মী ও গবেষক পান্নালাল মানি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার প্রায় ৭৬ লাখ মানুষ আর্সেনিক দূষিত জল পান করছে এবং ২২ লাখ মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার। অবিলম্বে আর্সেনিক দূষণ সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একযোগে যৌথভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

সাপে কামড়ালে কি করবেন? শীর্ষক প্রদর্শনীটি সর্পবিশারদ অবনীভূষণ ঘোষ বিভাগ নামকরণ করা হয়েছিল। সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে নির্বিষ ও বিষধর সাপ চেনা, সাপে কামড়ালে কি করবেন ও পাশাপাশি সাপ সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রদর্শণীতে নির্বিষ সাপ যেমন ,কালনাগিনী, হেলে, জলঢোড়া, বালিবোয়া, লাউডগা সাপগুলো সম্পর্কে বিশেষ ধারণা দেওয়া হয়, পাশাপাশি বিষধর সাপ যেমন — কালাচ, গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোরা প্রভৃতি সাপগুলো ও এদের কামড়ের চিহ্ন, লক্ষণ ও চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শণীতে আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞানকর্মী সুরজিৎ পাল, সুরজিৎ দাস ও পান্নালাল মানি প্রদর্শণী ও কর্মশালার আয়োজন করে ছাত্র-ছাত্রীদের জানান বিষধর সাপে কামড়ালে একমাত্র চিকিৎসা হলো দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে কর্মশালার মাধ্যমে সাপ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেওয়া হয়। চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রদর্শনীতে সহযোগিতা করেন। স্থানীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সাপ সম্পর্কে সমীক্ষা করে সাপের কামড়ের চিকিৎসা বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রদর্শণীতে বই, পত্রপত্রিকা সহ বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন স্টলের আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্ব আলোচনা করা হয়।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। সম্পাদক মণ্ডলী পান্নালাল মানি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ। ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০(সম্পাদক), ২৫৮৫-৬০৩২, ২৫৮০-৮৮১৬।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.